Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 38-43
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বনবিবির উপাখ্যান : সুন্দরবনের লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান

গৌতম কর
সহকারী অধ্যাপক, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়

Abstract

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘বনবিবির উপাখ্যান’; একই সঙ্গে এটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলে কীভাবে বন কেটে বসত করার সূত্রপাত, চারিদিকে অনন্ত জলরাশির মাঝখানে আবাদের মানুষের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সংস্কার, ব্যক্তিক সম্পর্ক, শ্রেণি সম্পর্ক, ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বনবিবির উপাখ্যান’ উপন্যাসটি। আসলে ব্যক্তিমানুষের গৌরবের প্রতি বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যধিক আস্থাশীল। সমাজে ও দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের এক অপরাজেয় রূপ আঁকতে গিয়ে দেশ ও কালের অবস্থাও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দু’-একটি রেখার টানে উজ্জ্বল হয়েছে জীবন ও জীবিকার সমস্যা। কৃষিপ্রচেষ্টা দুর্বল বলেই গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাকে গ্রামছাড়া করেছে। ভাগ্যসন্ধানী মানুষের কেউ চেনাগন্ডির সড়ক ধরে এসেছে শহরে - শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে; আবার কেউ কেউ গেছে লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যভূমিতে। দ্বিতীয় শ্রেণির এমনই একদল মানুষের জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাস।আসলে ব্যক্তিমানুষের গৌরবের প্রতি বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যধিক আস্থাশীল। সমাজে ও দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের এক অপরাজেয় রূপ আঁকতে গিয়ে দেশ ও কালের অবস্থাও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দু’-একটি রেখার টানে উজ্জ্বল হয়েছে জীবন ও জীবিকার সমস্যা। কৃষিপ্রচেষ্টা দুর্বল বলেই গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাকে গ্রামছাড়া করেছে। ভাগ্যসন্ধানী মানুষের কেউ চেনাগন্ডির সড়ক ধরে এসেছে শহরে - শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে; আবার কেউ কেউ গেছে লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যভূমিতে। দ্বিতীয় শ্রেণির এমনই একদল মানুষের জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাস।অরণ্যজীবনের অসাধারণ বর্ণনায়, সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা, বাতাস, মাটি, জঙ্গল ইত্যাদির বাস্তবতার রেফারেন্সে কাহিনি ডালপালা মেলে ধরেছে -- ‘বনবিবির উপখ্যান’-এ এভাবেই অব্যাহত থেকেছে অন্তর্বয়ন। এবং দেখতে পাই বাস্তব এবং অনুভবকে লেখক মেলাবার চেষ্টা করেছেন শিল্প-বাস্তবতার সঙ্গে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সবমিলিয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বনবিবির উপাখ্যান’ সুন্দরবনের লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান। প্রান্তিক মানুষদের অম্লমধুর দিনযাপনের নব নিরীক্ষার উৎসমুখ।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনাদৃত ও উপেক্ষিত নাম বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০১)। যদিও প্রায় চার দশকের কাছাকাছি সময়পর্বের (১৯৫৩-১৯৯৫) নিরবচ্ছিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় তিনি রচনা করেছেন বেশ কিছু উপন্যাস, ছোটগল্প এবং ভ্রমণসাহিত্য। এক সময়ে ছিলেন ‘দেশ’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ‘সংবাদ প্রতিদিন’ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি তাতে গ্রাম-বাংলা ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে ফিচার লিখেছেন। ‘যুগান্তর’ পত্রিকার গ্রন্থবার্তা সম্পাদনা করেছেন। প্রায় তিন বছর ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকাটির কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন। ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর। চরম অভাব ও দারিদ্রের মধ্যেও নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে মনোনিবেশ করেছেন লেখায়। তাঁর সবক’টি উপন্যাস ও ছোটগল্প

শিল্পসুষমার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে না পারলেও সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনাতে তাঁর সৃজনী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বনবিবির উপাখ্যান'; একই সঙ্গে এটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলে কীভাবে বন কেটে বসত করার সূত্রপাত, চারিদিকে অনন্ত জলরাশির মাঝখানে আবাদের মানুষের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সংস্কার, ব্যক্তিক সম্পর্ক, শ্রেণি সম্পর্ক, ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' উপন্যাসটি। আসলে ব্যক্তিমানুষের গৌরবের প্রতি বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যধিক আস্থাশীল। সমাজে ও দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের এক অপরাজেয় রূপ আঁকতে গিয়ে দেশ ও কালের অবস্থাও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দু'-একটি রেখার টানে উজ্জ্বল হয়েছে জীবন ও জীবিকার সমস্যা। কৃষিপ্রচেষ্টা দুর্বল বলেই গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাকে গ্রামছাড়া করেছে। ভাগ্যসন্ধানী মানুষের কেউ চেনাগন্ডির সড়ক ধরে এসেছে শহরে - শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে; আবার কেউ কেউ গেছে লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যভূমিতে। দ্বিতীয় শ্রেণির এমনই একদল মানুষের জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাস।

বনমাতা বনবিবির বন্দনা দিয়েই শুরু হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি – "বনের মধ্যে বনবিবির কতরে ভাই খেলা/চতুর্দিকে গাঙেরপানি, মধ্যে গোলের মেলা।" সুন্দরবনে জনপদভূমি গড়ে ওঠার মাহেন্দ্রক্ষণ থেকেই ধর্মবোধ-বিশ্বাস-সংস্কার, স্থান-কাল-পাত্রের পরিস্থিতি সাপেক্ষে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। মানষের চিন্তা-চেতনার এমন মিথস্ক্রিয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ 'বনবিবি'। তিন 'জ' এর সমাহার হল সুন্দরবন অঞ্চল। প্রথম 'জ'য় জল, দ্বিতীয় 'জ'য় জঙ্গল, আর তৃতীয় 'জ'য় জীব। এখানকার আদিবাসী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টান বা যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে 'বনবিবি' 'দেবী' পর্যায়ে উন্নীত এক সমন্বয়ী দেবী।

বন+বিবি = বনবিবি। দ্বি-শব্দ জাত। 'বন' অর্থাৎ অরণ্য, আর 'বিবি' অর্থে (ফার্সি বীবী), মুসলমান কুলবধূ বা কুলীন স্ত্রী। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ কন্যাকেও বাংলা পরিভাষায় বিবি বলা হয়। "হিন্দু বা বাঙালি মাতৃ-ভাবময় বনবিবি 'বনবিবি মা', 'বনদুর্গা', 'বনচণ্ডী', 'বনষষ্ঠী', 'বিশালাক্ষী' ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছেন। অরণ্যদেবী অরন্যের রক্ষাকর্ত্রী – মুসলিমযুগে বনবিবি হয়েছেন।"[১২] হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণির মানুষই ভক্তির আতিশয্যে মাতৃসমা কুলবধূকে দেবীপদে উন্নীত করেছেন। ভক্তির ভাবপ্রবাহে বনদেবী মুসলিম সমাজে প্রথম পূজিত হলেও পরবর্তী সময়ে হিন্দু প্রভাবিত দেবীরূপেও অধিষ্ঠিত হন। মুনশী মোহাম্মদ খতের কিংবা আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত 'জহুরানামা'য় তিনি 'বোনবিবি' নামে উল্লিখিতা।[১৩] এমনকী বনবিবি সংশ্লিষ্ট পালাগান রচয়িতাদের বিভিন্ন পালাগানেও 'বোনবিবি' নাম প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবনসম্পৃক্ত অরণ্যদেবী 'বনবিবি'। জঙ্গল নির্ভর জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট জেলে, মৌলে, কাঠুরে, মাঝি-মাল্লা, বাউলে বা জঙ্গল হাসিল করা গৃহী-শ্রমজীবী মানুষেরাই বনবিবির মূল সেবক। দক্ষিণরায়ের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতেই বনবিবির বাদাবনে আগমন। ধর্ম, শ্রেণি, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ অরণ্যদেবী হলেন এই বনদেবী।

এবার উপন্যাসের মূল কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করা যেতে পারে। বুড়ো বাসুকি নদীর পাহারায় গড়ে উঠেছে যে দ্বীপ, এবং যে দ্বীপ নিয়ে একটাই লাট। কাগজ-পত্রে তা কলকাতার চৌধুরীদের লাট। হিসাব অনুযায়ী প্রায় পঁচিশ হাজার একর জমি নিয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে জলরাশি বেষ্টিত এই লাট বা দ্বীপ – যার নাম চৌধুরীদের আবাদ, মূলতঃ এই আবাদই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রভূমি। লেখকের সৌন্দর্য-সচেতন মন উপমা চয়ন করে বলেছে – "দ্বীপগুলি যেন শ্রীচরণের ঘুঙুর, আর নদীগুলো সেই ঘুঙুর বাঁধার সুতো। একটু নড়ে উঠলেই শব্দ ওঠে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। সুতোয় সুতোয় জট পাকিয়ে যাওয়ার মতো নদীতে নদীতে জট। যেন গোলকধাঁধা। কোথায় শুরু আর

কোথায় তার শেষ কে জানে! ------- নাম তার বঙ্গোপসাগর। উত্তরে যাবে? ধানভাঙা সিঁড়ির দেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার। আর পুবেই যাও কি পশ্চিমেই যাও, ছোট ছোট দ্বীপ; কোনটা আঙুরের মতো গোল, কোনটা সিমের মতো বাঁকা, আবার কোনটা গোলও নয়, বাঁকাও নয়। কাঁকড়ার মতো চারপাশে দাঁড়া ছড়ানো। এমনিধারা আরো কত। ছোট, বড়, হাজার হাজার, অসংখ্য। সত্যি সত্যি ঝুম ঝুম করে শব্দ হয় দ্বীপগুলির মধ্যে।”[১৪] আসলে দ্বীপগুলির মধ্যে এক সজীব সত্তাকে অনুভব করেছিলেন বরেন। চৌধুরীদের আবাদের পাশাপাশি খুব সঙ্গতভাবেই সংযুক্ত হয়েছে ঘোষবনের কাহিনি। চৌধুরীদের আবাদ থেকে দূরবর্তী ঘোষবনের জমিদারি স্বত্ব ছিল বর্ধমানের ঘোষেদের। হাতবদল হয়ে এখন মালিকানা মহাবীর সিংহরায়ের। তাঁর কাছ থেকেই পাদরি সাহেবেরা একশো বিঘা জমি পত্তনি নিয়েছে। বুড়ো বাসুকির পাড় ধরে এগোলেই ছোট-বড় নানান আবাদ দেখতে পাওয়া যাবে। চৌধুরীদের আবাদ পত্তনের কাজ সবে শুরু হলেও বর্তমানে ঘোষ বনের আবাদ বেশ জমজমাট। মাটিকে গর্ভবতী করে তুলতে সেখানে চলে চাষ-আবাদ। কাহিনির সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। লেখক কাহিনির প্রথমেই সাল এবং মাস উল্লেখ করেছেন - “বাংলা তেরশ বাইশ। কার্তিক মাস, শুক্লপক্ষ।”[১৫]

চৌধুরীদের ছোটছেলে অর্থাৎ ছোটকর্তা বিষয়ী মানুষ। আবাদ করার কথা তাঁর মাথাতেই প্রথম জাগে। তিনিই চৌধুরী পরিবারের প্রাক্তন নায়েব মশাইয়ের যোগ্য পুত্র নির্ঝঞ্ঝাট অবিবাহিত দয়াল ঘোষকে বাদায় আবাদ গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন। দয়াল ঘোষের নেতৃত্বে জনা চল্লিশেক কাঠুরে, সাঁওতাল ও নিম্নশ্রেণির মানুষ, এছাড়াও সুন্দরবনের পাকা অভিজ্ঞ লোক রজনী, যার বেশিরভাগ সময়টাই কেটেছে বনে-জঙ্গলে; সামান্য একটা লাঠিকে সম্বল করে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে আসা ঈশান, মকবুল প্রমুখ মিলিতভাবে জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছে। একদিকে বুড়ো বাসুকির আস্ফালন ও আক্রোশ, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীর ভয়ংকরতা, অন্যদিকে চৌধুরীদের স্বপ্নপূরণের কর্মকাণ্ড। চৌধুরীরা বিশেষতঃ ছোটকর্তা চেয়েছে – “এখানে জনপদ বসুক, হাট হোক, বাজার হোক, এই বুড়ো বাসুকির উপর দিয়ে হাজারে হাজারে নৌকো চলুক, ব্যাপারী আসুক, ঘাটে ভিড়ুক, হোক স্কুলবাড়ি, পাঠশালা মক্তব। আর সবার উপরে এর নাম হোক চৌধুরীর আবাদ।”[১৬] মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও সংগ্রামের এক আদিম সাহসী প্রক্রিয়া।

আগুনের তাপে পোড়া ইটের মতো শক্ত চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে মাটি। এই মাটির দিকে তাকিয়ে দয়াল ঘোষ চমকে ওঠেন। মাটি কোথায়, এ যে স্তূপ। এর উপর কি করে যে লোক ফসল ফলাবে, কে জানে! চৌধুরীদের আবাদ করার খেয়ালের কোনো যুক্তিই খুঁজে পান না দয়াল। তবু আবাদ করার দায়ভার যখন ওরই, তখন আর ওসব নিয়ে ভাবলে চলে না। দয়াল ঘোষ পুরোদমেই উৎসাহ দেন সবাইকে, সাবাশ সাবাশ, যত তাড়াতাড়ি কাজটুকু সমাধা করা যায় ততই মঙ্গল।

এই দ্বীপের আবাদ তৈরির কঠিন সংগ্রামে ভয় আছে, বিষাদ আছে, এমনকী পায়ে পায়ে রয়েছে মৃত্যুভয়, তবুও এই সকল নিম্ন শ্রেণির মানুষ এই গভীর অরণ্যেও কাজ করার মধ্যে পায় আনন্দ ও রোমাঞ্চ। সংস্কার এদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই আবাদের কাজ যখন তীব্রগতি লাভ করেছে, তখনই দেখা দিল এক নতুন উত্তেজনা। হঠাৎই একদিন দ্বীপের ভেড়িতে আটকে থাকা নৌকায় একটি বসন্ত রোগাক্রান্ত কিশোরীকে দেখা যায়। নাম তার গৌরী। সারা গায়ে মসুর ডালের মতো ছড়ানো অসংখ্য গুটি দানা। সন্দেহ নেই, মায়ের দয়াতেই আক্রান্ত হয়েছে সে। বিষ ব্যথায় জর্জর হয়ে কাতরাচ্ছে। বেচারির এক মাথা চুল - রুক্ষ, অযত্নে জট ধরে গেছে। সারা গায়ে কাপড় এলোমেলো। চোখের মণি কড়ির মতো সাদা। দিন দুয়েক আগে যখন ধরা পড়ল অসুখটা, তখনই ওকে ত্যাগ করেছে নিমাই। ওঝা ডাকার নাম করে সেই যে ও ডিঙি থেকে ডাঙায় নামল সেই ওর শেষ নামা। অথচ এই নিমাই একদিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল গৌরীকে – ফিটন গাড়ি করে কালীঘাটের কালী দেখাবে, খিদিরপুরের জাহাজঘাটায় নিয়ে যাবে, চিড়িয়াখানা দেখাবে, মনুমেন্ট দেখাবে, আরও কত কী। গৌরী মন্ত্রমুগ্ধের

মতো নিমাইকে বিশ্বাস করেছিল। তাই মায়ের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল গৌরী, কিন্তু মানুষ যে এত স্বার্থপর হতে পারে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সেই কিশোরী।

গৌরীকে কেন্দ্র করে বিস্ময় ও শঙ্কা, কৌতূহল ও অনুভব এবং সংস্কার ও বিশ্বাসের টানাপোড়েনে আবাদের লোকজন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে যেমন বিপদের সম্ভাবনাকে কোনরকম গ্রাহ্য না করেই ঈশান অপরূপা কিশোরী গৌরীকে সুস্থ করে তুলতে সেবা-পরিচর্যা করে, আবার অন্যদিকে রজনীর মতো অনেকেরই মনে হয় – 'মায়ের দয়ায় রূপ ধরে এসেছেন গো ছলনাময়ী' – আগুন নিয়ে খেলা, একদিন পুড়ে খাক হয়ে যাবি।"[১৭] বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন গ্রাম্য এই মানুষগুলোর যুক্তি ও বিশ্বাসের আলো-আঁধারিকে। সংস্কার এইভাবেই তাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। আবাদের মানুষজনের বেশিরভাগই আশঙ্কা করেছেন বন কাটবার আগে, বনবিবির পুজো না হওয়ার ফলেই এরকম অমঙ্গল। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো সমবেতভাবে দয়াল ঘোষের কাছে বনবিবির পুজো করার দাবি জানিয়েছে। আবার অন্যদিকে দয়াল ঘোষের উপলব্ধিতে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে। আবাদের মানুষজন যখন রাত্রে সকলেই আমোদে মত্ত, তখন দয়াল ঘোষ আচম্বিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য থেকে আবির্ভূতা জ্যোতির্ময়ী দেবী দর্শন করলেন – "দয়াল ঘোষ দেখলেন, এক শুভ্রবসনা দেবীমূর্তি, জ্যোতির্ময়ী। মাথায় হীরকখচিত টোপর। গলায় গোলাপের মালা। ধীরে ধীরে হেঁটে আবার চন্দ্রালোকের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।"[১৮] এরপরই দয়াল ঘোষের মনের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। এখানেই লৌকিক-অলৌকিকের সীমানা একাকার হয়ে গেছে। পাঠকের মনেও সৃষ্টি হয়েছে এক অজানা দোলাচলতা। তবে আমাদের মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধ চেতনা বিষয়টিকে অতিরিক্ত বা অপ্রাসঙ্গিক হতে বাধা দিয়েছে। বরং চেতনার গভীরে গিয়ে তা ধাক্কা দেয়।

আসলে প্রাচীন যুগ থেকেই সাধারণ মানুষ যে-শক্তির নিকট অসহায়, তাদের মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত অতিমানব তৈরি করে, তাঁর হাতে শত্রু-প্রতিরোধক অস্ত্র তুলে দিয়ে আর্ত মানুষের ত্রাতা রূপে গ্রামের প্রবেশপথে দাঁড় করিয়েছে। এইসব দেবতা সুন্দরবনের জনজাতির নিকট পরিবেশ পরিস্থিতিজাত লোকদেবতা রূপে সুদীর্ঘকাল ধরে পূজিত হচ্ছেন, সমাজ বিবর্তনের ধারায় এদের রূপের ও নামের পরিবর্তন ঘটলেও দেবতা সম্পর্কিত বিশ্বাস প্রায় অপরিবর্তিত আছে। দয়াল ঘোষের এই গৌরীর মধ্যে দেবীদর্শন রূপকথার মায়াজাল তৈরি করলেও তা তথ্যগত কারণ-সঙ্গত। বাস্তবে সংবেদনশীল, শুভবোধসম্পন্ন মানুষেরা প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা দিয়ে তাঁদের স্বপ্নের, প্রত্যাশার সমাজ গঠন করতে চান। কিন্তু অনাদিকাল থেকে অশুভশক্তি অবিরত বিবর্ণ; বিপন্ন, নিষ্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছে সমষ্টিগত মানুষের এই ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাকে। তখন শুভবোধে-নিবেদিত মানুষ কিংবা স্রষ্টা প্রবল আগ্রহে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে অশুভশক্তিকে। কিন্তু পাশবিক বল তাঁর নেই। আর তখনই তিনি রং-তুলি নিয়ে কল্পনার মায়াজালে চিন্তার উড়াল ডালা মেলে সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতর করে তোলেন। চারিদিকে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অবস্থিত দয়াল ঘোষের মনেও হয়তো এমন ভাবনা পূর্ণতা পেয়েছে। অন্যদিকে কাকদ্বীপ থেকে পালিয়ে আসা পিছুটানহীন ঈশান বসন্ত রোগাক্রান্ত গৌরীর সেবা করতে গিয়ে এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হল। তা থেকে বিশুমিঞা এবং আরো কয়েকজন। এমনকী শেষ পর্যন্ত বিশুমিঞার মৃত্যুতে আবাদের সকলের মধ্যেই ভয় ও বিদ্রোহ লক্ষ করা গেল। রজনী দয়াল ঘোষের অজ্ঞাতে কয়েকজনের সাহায্যে মাঝরাতে গৌরীর নৌকো ভাসিয়ে দিল বুড়ো বাসুকির জলস্রোতে। এবং দয়াল ঘোষকে রাজি করিয়ে আবাদ ফেলে রেখে সকলেই পাড়ি দিল কলকাতার পথে। নেতৃত্বে ছিল রজনী।

পরবর্তী কাহিনি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, উপন্যাসের বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটের সৌজন্যে অনিবার্যভাবেই কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে আর এক আবাদস্থল, ঘোষবন। কেননা গৌরীর নৌকা ভাসতে ভাসতে ঠাঁই পায় এই খ্রিস্টান কলোনি ঘোষবনে। ফাদার গ্যাব্রিয়েলের তত্ত্বাবধানে দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড-এর আশ্রয়ে গৌরীর সুস্থ হয়ে ওঠা এবং নিত্যকার দিনযাপন। এখানেই তার লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা এবং তার কাছেই পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শে সম্মতি জ্ঞাপন। লক্ষ্মণের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও গৌরীর আবার অজানা পথে পা বাড়ানোর একটাই শর্ত -- তাকে বিদ্যাপুরীতে পৌঁছে দিতে হবে।

ইচ্ছে এবং সংগ্রাম কখনো থেমে থাকে না, পরবর্তী পর্যায়ে দয়াল ঘোষ চৌধুরীদের আবাদে ফিরতে না চাওয়ায় রজনীর নেতৃত্বেই জনা তিরিশেক লোক, মালপত্র বোঝাই চারটে বড় বড় নৌকা, একটা বজরা নিয়ে কলকাতা থেকে পাড়ি জমিয়েছেন, এবারে স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন ছোটকর্তা নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্যাভিচার ও ভোগবাসনা আরো একবার প্রকাশিত হল উপন্যাসের পরতে পরতে। পানিহাটির কামিনীবালা, মদ-মাংস ইত্যাদির প্রসঙ্গ, অন্যদিকে আবাদে সাপ-বাঘ-কুমির ইত্যাদির উপস্থিতিতে বিস্ময়, শঙ্কা ও কৌতূহলে উপন্যাসের কাহিনিতে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বাঘের আক্রমণে একজনের মৃত্যু, পুনরায় গৌরীকে নৌকায় দেখে অপদেবীর উপস্থিতিতে নতুন বিপদের আশঙ্কায় আবাদের সকলেই বনবিবির পুজো করবার সংকল্প করেছে। নরেন্দ্রনারায়ণ আবাদকর্মীদের মনোভাব বুঝে বনবিবির পুজোয় কলকাতা থেকে দয়াল ঘোষকে আনতে লোক পাঠিয়েছেন।

অন্ধকার রাত্রে বনবিবির নৌকায় গৌরীর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছে ঈশান। বিস্ময়বিমুগ্ধ ঈশান গৌরী ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভাবিত হয়েছে। এখানে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষ্মণ ও ঈশানের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের চিত্রণে ঋদ্ধ করেছেন উপন্যাসের জটিলতাকে। গৌরী শেষ পর্যন্ত ঈশানের তৎপরতায় স্থান পেয়েছে কাছারিবাড়িতে। অন্যদিকে গৌরীর থেকে বিচ্ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া লক্ষ্মণ ভয়ংকর আক্রোশে ভেড়ির একটি দুর্বল বাঁধ ভেঙে দিয়ে আবাদের ক্ষতি করতে চেয়েছে, কিন্তু একক ষড়যন্ত্রের নেতা নির্বোধ লক্ষ্মণ ধরা পড়ে গেছে আবাদের মানুষদের কাছে। শেষ পর্যন্ত তাদের তাড়া খেয়ে রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়ে বুড়ো বাসুকির তলায় তলিয়ে যায় লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের মৃত্যুতে গৌরীর আকুল ক্রন্দন, ঈশানের প্রতি দোষারোপে উপন্যাসের কাহিনি বাঁক নিতে থাকে।

'বনের মধ্যে বনবিবির কত রে ভাই খেলা।'[১৯] প্রথমবার গৌরী দর্শনে যে-দয়াল ঘোষ বিষয়-আশয় সমস্ত কিছু ত্যাগ করে অধ্যাত্ম-জীবন গ্রহণ করেছেন, তিনি পুনরায় পুরোহিত কপিলকে সঙ্গে নিয়ে আবাদে এসেছেন বনবিবির পুজো করতে। তাঁর কাছে বিদ্যাপুরী গ্রামের মাহাত্ম্য প্রাচীন ও চিরন্তন। গৌরীর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছেন -"মানুষ মায়ার জীব। মায়ায় জড়িয়ে থাকি বলেই আমাদের এই কষ্ট। কিন্তু মা, মায়ার আবরণ যদি একবার সরিয়ে ফেলা যায়, দেখবে সব ফাঁকি। জগৎ সংসারে কেবল ইট, কাঠ, পাথর, মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই।"[২০] আর এখানেই গৌরী নিজেকে আবিষ্কার করেছে অন্যভাবে। উপলব্ধি করেছে মহাশূন্যে সে একা। দয়ালবাবুর পুনরায় গৌরীর মধ্যে মা জগন্ময়ীর মূর্তি দর্শন, এবং আহত হরিণের মৃত্যুতে শোকাহত ঈশানের সমুদ্রপ্রমাণ কান্নায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

'বনবিবির উপাখ্যান' উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে ফুটনোটে বলা আছে দ্বিতীয় পর্ব 'দখল' যন্ত্রস্থ। কিন্তু এখনো তা ছাপাখানা থেকে মুক্তি পায়নি। হয়তো কোনদিনও পাবে না। তবে 'দখল' প্রকাশিত না হলেও 'বনবিবির উপাখ্যান'-এর সমগ্রতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাদাবনের আবাদকর্মীদের কেন্দ্র করে যে-বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা বাস্তব এবং এক বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত হয়েছে। আসলে সমাজ কখনো থেমে থাকে না, পরিবর্তনই সমাজের লক্ষণ, কিন্তু তারই মধ্যে দয়ালের দ্বৈতসত্তার পরিচয়, গৌরীর স্রোতে ভেসে চলা জীবন, রজনীর কর্তৃত্ব, ঈশানের উদার মানবিকতা, চৌধুরীদের সামন্ততান্ত্রিক মেজাজী মনোভাব এবং আবাদকর্মীদের অন্ধবিশ্বাস, সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব, সর্বোপরি সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা, সৌন্দর্য ও ভয়ংকরতা সবকিছু মিলিয়ে যা একান্তই শিল্পবাস্তব।

উপন্যাসের কাহিনি বলয়ে আবাদের মূল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ, রজনীর কর্তৃত্ব, লক্ষ্মণ ও ঈশানের দ্বৈরথ, গৌরীর মধ্যে রজনীর ছলনাময়ী বা মায়াবিনীর সন্ধান যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এও সত্য এই অপদেবীকে খর্ব করতে বনবিবির পুজো দেওয়ার আগ্রহ। আসলে ক্রমবিবর্তনে অনুকূল পরিবেশে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ঘটলেও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে আমরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি। তবে মাটির পুতুল বনবিবির পরিবর্তে দয়ালের

জীবন্ত গৌরীর ভিতর বনবিবির সন্ধান কাহিনির মধ্যে নতুন মাত্রা আনে। ঈশানের গৌরীকে সেবার মধ্যে যেমন উদার মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি জীবনরসে নিষিক্ত হয়ে যায় লক্ষ্মণের আক্রোশ ও নিহত হওয়া। চৌধুরীদের আবাদ তৈরি করা যেমন সৃজনধর্মী মানসিকতার দ্যোতক, তেমনি নারীপোষায় সামন্ততান্ত্রিক আমেজটাকে টিকিয়ে রাখার চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ঘোষবনের চার্চসংস্কৃতি, ধর্মজীবন জীবনধর্মের এক স্নিগ্ধরূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। দুই সংস্কৃতির বৈপরীত্যের ফলে স্পষ্ট হয়েছে উভয়ের মানসিক চেতনা। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, লক্ষ্মণ ও গৌরীর ঘোষবন থেকে পালিয়ে আসাও চিরকালীন মানসপ্রবণতারই নজির। অরণ্যজীবনের অসাধারণ বর্ণনায়, সুন্দরবন অঞ্চলের গাছপালা, বাতাস, মাটি, জঙ্গল ইত্যাদির বাস্তবতার রেফারেন্সে কাহিনি ডালপালা মেলে ধরেছে -- 'বনবিবির উপখ্যান'-এ এভাবেই অব্যাহত থেকেছে অন্তর্বয়ন। এবং দেখতে পাই বাস্তব এবং অনুভবকে লেখক মেলাবার চেষ্টা করেছেন শিল্প-বাস্তবতার সঙ্গে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সবমিলিয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনবিবির উপাখ্যান' সুন্দরবনের লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান। প্রান্তিক মানুষদের অম্লমধুর দিনযাপনের নব নিরীক্ষার উৎসমুখ।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১। সুরজিৎ দাশগুপ্ত: 'যুগবদলে বাংলা উপন্যাসের রূপবদল', দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা - ১৩১
২। সুব্রত চট্টোপাধ্যায়: 'সুন্দরবনের পটভূমিতে ছোটগল্প ও উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৩৪৭
৩। শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম: 'মধ্যযুগের বাংলা ও সুন্দরবনঃ কাব্যিক প্রতিভাস', 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য', সমকালের জিয়নকাঠি,নভেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৩
৪। কৃষ্ণকালী মণ্ডল: 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়', নব চলন্তিকা, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬১
৫। কমল চৌধুরী: 'চব্বিশ পরগণা, উত্তর ও দক্ষিণ সুন্দরবন', দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৪
৬। প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী: 'রবীন্দ্রনাথ, হ্যামিলটন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা','পশ্চিমবঙ্গ', জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪৫১
৭। বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'ইছামতী উপন্যাস', উপন্যাস চতুষ্টয়, পাঞ্চজন্য, ২০১১
৮। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়: 'আমার দেখা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩
৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১২৪
১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১২১
১১। তদেব, পৃষ্ঠা-১২১
১২। ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী: 'সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বনবিবি: একটি পর্যালোচনা', নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, পঞ্চম সংখ্যা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২১
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২১
১৪। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়: 'বনবিবির উপাখ্যান', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-১
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৩
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১১
১৭ তদেব, পৃষ্ঠা-১৬
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৮
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা-২৯২
২০। তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৩